বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা

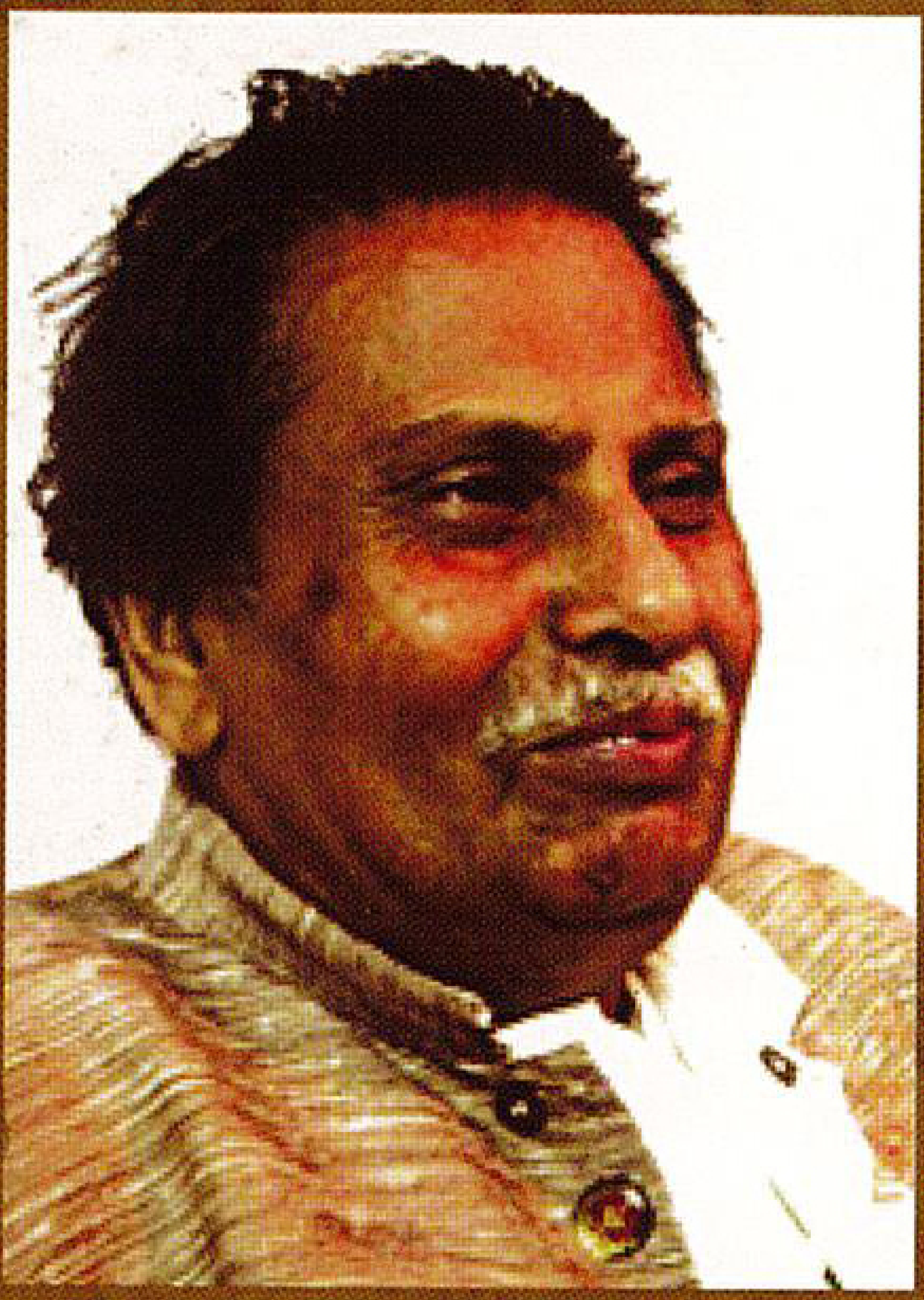

যতীন সরকার
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নাসিরাবাদ কলেজ

মুহম্মদ রিয়াজুল ইসলাম
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নাসিরাবাদ কলেজ

গোলাম সামদানী কোরায়শী
(মরণোত্তর)
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
নাসিরাবাদ কলেজ

নাসিরাবাদ কলেজ
ময়মনসিংহ

বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা

নাসিরাবাদ কলেজ
ময়মনসিংহ

নাসিরাবাদ কলেজ
জ্ঞানার্জন কর

বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা

উপদেষ্টা
মো. আমিনুল হক শামীম সিআইপি
আহমেদ শফিক

সম্পাদক
ড.আমিনুর রহমান সুলতান

সম্পাদনা সহযোগী
আব্দুল মান্নান ফরিদী
খোঃ হাফিজুর রহমান
মুর্শিদা খানম
মোঃ সাইফুল ইসলাম

প্রকাশকাল
৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বাণী

ব্রহ্মপুত্র নদবিধৌত মহুয়া-মলুয়ার দেশ নামে খ্যাত শিক্ষার নগরী ময়মনসিংহের একটি ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ নাসিরাবাদ কলেজ । এ প্রতিষ্ঠানটি এ জনপদে বাতিঘর হিসেবে জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখা জ্বালিয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোকিত ও উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন প্রজন্ম তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে সেই ১৯৪৮ সালের প্রতিষ্ঠাকাল হতে। এ কলেজটি যাঁদের নিরলস শ্রমে দেশজুড়ে খ্যাতি লাভ করেছে, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন অধ্যাপক যতীন সরকার, অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শী ও অধ্যাপক মুহম্মদ রিয়াজুল ইসলাম। তিন জনের মধ্যে অধ্যাপক যতীন সরকার এবং অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শী স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হয়েছেন। প্রথম জন জীবদ্দশায় দ্বিতীয় জন মরণোত্তর। আর অধ্যাপক মুহম্মদ রিয়াজুল ইসলাম স্থানীয় পর্যায়ে অত্যন্ত খ্যাতি সম্পন্ন একজন প্রবীণ শিক্ষক। এই গুণীজনদের দ্বারা বৃহত্তর ময়মনসিংহবাসীর মতো নাসিরাবাদ কলেজ পরিবারও গৌরবান্বিত। আমরা এই তিন গুণীজনের দু'জনের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। আর মরহুম গোলাম সামদানী কোরায়শীর আত্মার শান্তি কামনা করি।

মো. আমিনুল হক শামীম সিআইপি
সভাপতি, গভর্নিং বডি
নাসিরাবাদ কলেজ, ময়মনসিংহ

বাণী

ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় নাসিরাবাদ কলেজ, ময়মনসিংহ আজ দেশের প্রাচীনতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটি যে সকল শিক্ষকের মনন-মেধায় খ্যাতির দিগন্ত ছুঁয়েছে, তাদের মধ্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল নামগুলো হলো অধ্যাপক যতীন সরকার, অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শী ও অধ্যাপক মুহম্মদ রিয়াজুল ইসলাম। অধ্যাপক যতীন সরকার ও গোলাম সামদানী কোরায়শীর স্বাধীনতা পদক অর্জন নাসিরাবাদ কলেজ পরিবারকে বিপুলভাবে গৌরবান্বিত করেছে। গুণী এ তিন সাবেক শিক্ষককে সংবর্ধিত করার সুযোগ পেয়ে নাসিরাবাদ কলেজ পরিবার প্রচণ্ড রকম গৌরবান্বিত। আজন্ম এই গুণীজনরা এ কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকবেন। আমরা এ তিন গুণী শিক্ষক ও বরেণ্য বুদ্ধিজীবীর দু'জনের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। আর মরহুম গোলাম সামদানী কোরায়শীর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

আহমেদ শফিক
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
নাসিরাবাদ কলেজ, ময়মনসিংহ

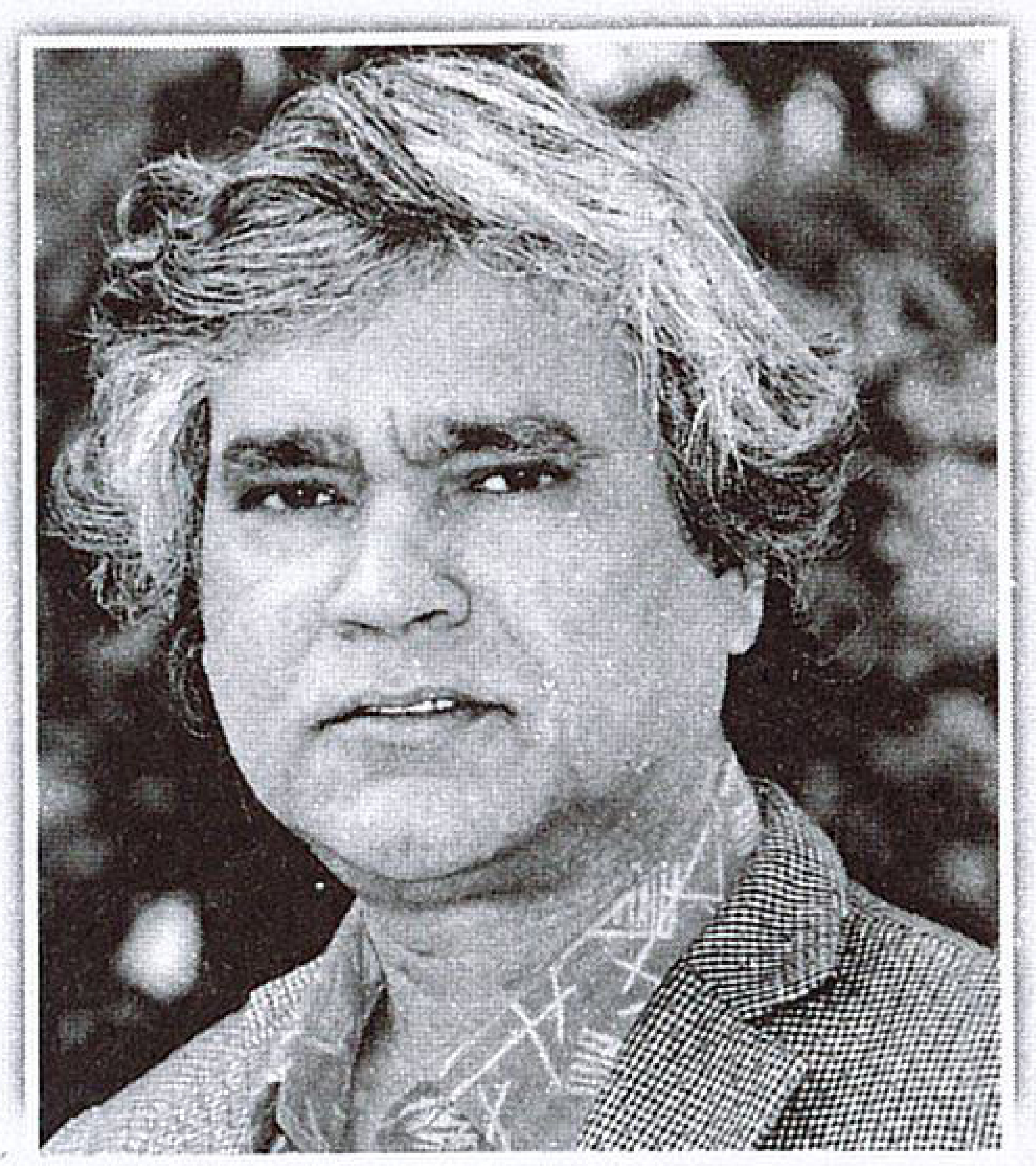

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষা মানবসম্পদে তখনই পরিণত হয় যখন সুশিক্ষা ও সত্যিকারের শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা অনন্য। সুশিক্ষার অন্যতম শর্ত হচ্ছে মানবকল্যাণে ব্রতী হওয়া, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলা, আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া।

এতোসব বিষয়ে আমাদের নাসিরাবাদ কলেজের প্রাক্তন তিন জন অধ্যাপকই বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ যতীন সরকার, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ গোলাম সামদানী কোরায়শী ও বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ মুহম্মদ বিয়াজুল ইসলাম ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তাঁদের ঋণ আমরা স্বীকার করছি। নতুন প্রজন্মের মাঝে তাঁদের কর্ম ও সৃষ্টি তুলে ধরার জন্যেই বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মননার আয়োজন।

বিগত দিনের মতো নৈসর্গিক পরিবেশে নাসিরাবাদ কলেজের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে মানবিক সমাজ গড়ার সম্পন্নতা নিয়ে প্রতিষ্ঠা পাবে আগামী দিনেও এই প্রত্যাশা।

ড. আমিনুর রহমান সুলতান
আহব্বায়ক
বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা কমিটি ও
সদস্য, গভর্নিং বডি
নাসিরাবাদ কলেজ, ময়মনসিংহ

নাসিরাবাদ কলেজের ইতিহাস

নাসিরাবাদ কলেজ বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তর ঐতিহ্যবাহী বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠাকাল হতে অদ্যাবধি এ প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে সুদীর্ঘ কালের অগ্রযাত্রার ধারাবাহিক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ আলহাজ রিয়াজ উদ্দিন আহ্‌মাদের (১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দ - ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ) নিরলস পরিশ্রম ও সুদক্ষ তত্ত্ববধানে ১৯৪৮ সালে প্রায় ১০ একর জমির উপর এ প্রতিষ্ঠানটি প্রথম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর ১৯৫৬ সালে সাধারণ উচ্চমাধ্যমিক কলেজ, ১৯৫৯ সালে ডিগ্রি কলেজ এবং ২০১০ সালে অনার্স কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে এ কলেজে উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাস ও অনার্স কোর্স অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে এবং পাঁচ হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থী নিয়মিত পড়াশোনার করার সুযোগ লাভ করছে। ১৯৯৯ সাল হতে এ কলেজে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এইচএসসি ও বিএ/বিএসএস কোর্সেও পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে অনেক শিক্ষার্থী।

ময়মনসিংহের প্রাচীন নামের সাক্ষ্য বহনকারী ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নাসিরাবাদ কলেজ দ্যুতি ছড়াচ্ছে বাংলাদেশ জুড়ে। এ কলেজের সুখ্যাতির মূলে রয়েছে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টা এবং সুদক্ষ গভর্নিং বডির সার্বিক তত্ত্বাবধান। এখানকার শিক্ষার পরিবেশ, পাঠদানের মান ও পরীক্ষার ফলাফল সর্বদাই তুলনামূলকভাবে সন্তোষজনক। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন প্রায় একশত শিক্ষক-কর্মচারী। তাদের কর্মদক্ষতা অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে। প্রতিষ্ঠাকাল হতে অদ্যাবধি যে সকল শিক্ষকের অবদানে এ প্রতিষ্ঠানটি সুখ্যাতির দিগন্ত বিস্তৃত করে আছে, তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক যতীন সরকার, অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শী এবং অধ্যাপক মুহম্মদ রিয়াজুল ইসলামের নাম স্বমহিমায় ভাস্বর। সম্প্রতি দুজন সাবেক শিক্ষকের জাতীয় পদক প্রাপ্তি এ কলেজের খ্যাতিকে আরো দীপ্যমান করেছে।

নাসিরাবাদ কলেজে শিক্ষা লাভ করে অগণিত শিক্ষার্থী আজ নানা কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, অনেকে দেশবরেণ্য ব্যক্তি হিসেবে রেখেছেন এবং রেখে চলেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তারা প্রতিনিয়ত দেশ-জাতি ও মানবতার কল্যাণে নিজেদের নিবেদিত রেখেছেন এবং রাখছেন। বিরামহীন পথ পরিক্রমায় ঐতিহ্যবাহী নাসিরাবাদ কলেজ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে অনাগত ভবিষ্যতে।

–সংগৃহীত

বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা
বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা
বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা
বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা
বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা
বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা
বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা
বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা
বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা
বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা
বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা
বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা
বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা
বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা
বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা
বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা

যতীন সরকার : সাঁকো বাঁধার কারিগর

রাজীব সরকার

'প্রবন্ধ' শব্দটির অর্থ প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন। যুক্তি আশ্রয়ী চিন্তাসমূহের মধ্যে যখন প্রকৃষ্ট বন্ধন রচিত হয় তখন তা প্রবন্ধে রূপান্তরিত হয়। মননশীল সাহিত্যের প্রধান শাখা প্রবন্ধ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সৃজনশীল রচনার যে সম্ভাবনা ও বিকাশ দেখা যায়, মননশীল রচনার ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। প্রবন্ধ সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় অনগ্রসর। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান বা স্প্যানিশ প্রবন্ধের তুলনায় বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য দুর্বল। এসব পাশ্চাত্য ভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি নিয়ে এমন সব প্রবন্ধ ও বই রচিত হয়েছে যা শুধু বিষয়বস্তুর গুণে নয়, রচনাশৈলীর গুণেও সাহিত্য পদবাচ্য। বাংলা সাহিত্যে মৌলিক চিন্তাসম্পন্ন মননশীল প্রাবন্ধিক দুর্লভ। সেই দুর্লভ প্রাবন্ধিকদের অন্যতম যতীন সরকার।

প্রাবন্ধিক যতীন সরকার বাঙালি বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৯৬৭ সালে 'পাকিস্তানোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা উপন্যাসের ধারা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে। এ জন্য বাংলা একাডেমি থেকে ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক স্বর্ণপদক লাভ করেন তিনি। দৈনিক পত্রিকায় ও সাহিত্যপত্রে গভীরতাস্পর্শী প্রবন্ধ নিয়মিত লিখে চললেও তাঁর প্রথম বই 'সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা' প্রকাশিত হয় বেশ বিলম্বে ১৯৮৫ সালে যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেধাবী সাহিত্য সমালোচক হিসেবে তিনি দু' বাংলাতেই খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় তাঁর মূল্যাবান প্রবন্ধের বই ও সম্পাদিত বই। এর বাইরে তাঁর অনন্য স্মৃতিকথা 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন' ও 'পাকিস্তানের ভূত দর্শন' পাঠকসমাজে বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যতিক্রমী বই 'গল্পে গল্পে ব্যাকরণ' ও 'ব্যাকরণের ভয় অকারণ' উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। প্রাবন্ধিক যতীন সরকারের সীমানা তাই সুদূরবিস্তৃত– সাহিত্যে ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা, দর্শন, সমাজতত্ত্ব ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনায় সমৃদ্ধ তাঁর দর্শনীয় সৃষ্টি ভাণ্ডার।

যে কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির জীবনদর্শন থাকে। মহৎ শিল্প বা লেখকও এর ব্যীতক্রম নন। নিজের জীবনদর্শনকে মূর্ত করে তোলা যতীন সরকারের প্রবন্ধের শিরোনাম 'আমি অদৃষ্টে বিশ্বাসী, নিয়তিবাদী ও বিজ্ঞান সচেতন।' তিনি দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী যা মার্কস এঙ্গেলসের চিন্তার সংহত রূপ। বিচার বিশ্লেষণহীন মার্কসবাদী তিনি নন। প্রকৃতি সমাজের দ্বান্দ্বিকতা, ইতিহাসের বিচিত্রবিধ গতি এবং ব্যক্তি মানুষের চিন্তা ও কর্মের বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তিনি

সচেতন। পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে বাদ ও প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে তত্ত্বের বোধ গড়ে ওঠার প্রাচীন ভারতীয় ন্যায়সূত্র তিনি কৈশোরেই চেতনায় ধারণ করেছিলেন। যৌবনে মার্কসীয় সাহিত্যপাঠ এবং নিবিড় অনুশীলন তাকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অনুসারী হতে প্রেরণা যোগায়। প্রথাগত মার্কসবাদীদের মতো ধর্মচর্চাকে অবজ্ঞা দৃষ্টিতে দেখেননি, অস্বীকার করেননি সভ্যতার অগ্রগতিতে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার প্রগতিশীল অবদানকে। তিনি আস্থা রেখেছেন বিপ্লবী লেনিনের কথায়। সমকালীন মার্কসবাদীদের অনেকেই যখন টলস্টয়কে 'বুর্জোয়া' আখ্যা দিয়ে বর্জন করতে চেয়েছিলেন তখন লেনিন বলেছিলেন, "কোনো শিল্পী যদি প্রকৃতই মহৎ হন তবে তাঁর রচনায় বিপ্লবের কোনো না কোনো মর্মগত অংশ প্রতিফলিত না হয়ে পারে না।" তাই ভাববাদী হওয়ার পরও রবীন্দ্রনাথের মতো মহত্তম শিল্পী যতীন সরকারের মানসগুরু। তিনি বিশ্বাস করেন–

"সঠিক কর্ম সম্পাদনের জন্য সঠিক তত্ত্বের আশ্রয় অবশ্যই নিতে হবে, কিন্তু কোনো পুরনো তত্ত্বই নতুন সমস্যার ক্ষেত্রে হুবহু প্রযুক্ত হতে পারে না; সে কারণেই প্রতিনিয়ত পুরনো তত্ত্বের পুনর্গঠন ও নবায়ন করে নিতে হবে, নতুন পরিস্থিতিতে উপজাত সমস্যার সমাধানের সূত্র নিজেকেই আবিষ্কার করে নিয়ে ধীরতার সঙ্গে কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হতে হবে।"

এই বোধ থেকেই তিনি ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছেন। পাভলভ প্রবর্তিত মস্তিষ্কভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের কুশলী প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি মধ্যবিত্ত ও কৃষকসহ প্রাকৃতজনের জীবনধারার নানা জটিল স্তরে আলোকপাত করেছেন। উন্মোচন করেছেন আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের বহুবিধ জট। তাঁর ঐতিহ্যনিষ্ঠা মুক্তবুদ্ধি, বস্তুবাদ ও সমাজতন্ত্রের দেশীয় প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন করেছে। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি অবলোকন করেছেন বাঙালির লৌকিক সংস্কৃতিকে। বস্তুবাদী ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনা আমরা পশ্চিম থেকে পেয়েছি- প্রচলিত ও ধারণাকে তিনি খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন প্রাচ্যে ও অতীতে এ চর্চা ছিল। এ ভূখণ্ডের মানুষের লোকায়ত জীবনদর্শনে ভাববাদ যেমন ছিল, তেমনি ছিল বস্তুবাদেরও প্রভাব। সত্য, ন্যায় সাম্যের ধারণা এদেশে ছিল। এখানেই জন্মগ্রহণ করেছেন শ্রীচৈতন্য, গৌতমবুদ্ধ, চার্বাক।

চিন্তা ও যুক্তির ঈর্ষণীয় ভারসাম্য বজায় রেখেছেন যতীন সরকার। প্রচলিত, জনপ্রিয় মতের বিরোধিতা করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। 'পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা' কবি হিসেবেই ইকবালের পরিচিতি। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা আড়ালে চলে গিয়েছিল ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের ডামাডোলে। ১৯৭৮ সালে 'গণসাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ 'ইকবাল আমাদের' এটি এমন এক সময় যখন বাংলাদেশে পাকিস্তানবাদী ভাবধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলছে। শুধু তাই নয়, প্রবন্ধটির লেখক অমুসলিম যতীন

সরকার। সবাইকে বিস্মিত করে তিনি লিখলেন পাকিস্তানে সৃষ্ট 'মানস প্রতিবন্ধ' থেকে মুক্ত হয়ে 'সুষ্ঠু' ও 'সংস্কার বর্জিত' ইকবাল চর্চা 'আমাদের নিজের গরজেই আবশ্যক'। তাঁর পর্যবেক্ষণ-

"সমস্যা মোকাবেলার একটি কার্যকর পথ হিসেবে ইকবালের দ্বারা যেমন ইসলামী ঐতিহ্য নির্বাচিত, অন্য কোনো কবির দ্বারা তেমনি নির্বাচিত হতে পারে অন্য কোনো ঐতিহ্য বা দর্শন; যেমন রবীন্দ্রনাথের অবলম্বন সাধারণভাবে 'হিন্দু দর্শন ও 'হিন্দু ঐতিহ্য' নামে যা পরিচিত, সেই ঔপনিষদিক তথা প্রাচীন ভারতীয় এতিহ্য। তাই বলে, রবীন্দ্রনাথের জন্যে 'হিন্দুর কবি' আখ্যা যে রূপ বিচার্য নয়, সে রূপই নয় ইকবালের প্রতি প্রদত্ত 'মুসলমানের কবি' অভিধা। ঐতিহ্যের পুনরাবর্তনে নয়, নবায়নের মধ্যেই একজন কবির সৃষ্টিকর্মের সার্থকতা...।"

কোনো সন্দেহ নেই এই প্রবন্ধটি যতীন সরকারের মৌলিক ও সাহস্য প্রয়াস। যে ইকবালের নামের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও ধর্মীয় আবহ একাকার হয়ে মিশে গিয়েছে সেই ইকবালের অসামান্য বৈপ্লবিক পঙক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন লেখক–

"ওঠো, দুনিয়ার গরিব ভুখাদিদের জাগিয়ে দাও
ধনীর প্রাসাদ প্রাকারের ভিত্তিকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে দাও
যে - ক্ষেত থেকে কিষাণের রুপি জোটে না
পুড়িয়ে দাও প্রতিটি গমের দানাকে"

ধর্মাশ্রয়ী হওয়া মানেই মুক্তবুদ্ধির বিপরীতে অবস্থান নেওয়া এমন একটি ধারণা আমাদের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচলিত অথচ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, পৃথিবীর প্রত্যেক জনগোষ্ঠীই ধর্মীয় চেতনার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, সেই পথের শেষ এখনো হয়নি। বিশেষ করে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার অধীন যে সমাজ, সে সমাজের মানুষ বুদ্ধির চর্চা করে থাকে। সে চর্চার মধ্য দিয়েই তার বুদ্ধি ও চিন্তা মুক্তির স্বাদ পায়। ধর্মকেন্দ্রিক সমাজ কাঠামোতে মানুষের মুক্তবুদ্ধির চর্চা তাই ধর্মাশ্রিত হওয়ার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই, এমনকি প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতির সংগ্রামেও অনেক সময় ধর্ম হয়ে ওঠে সহযাত্রী। কারণ, প্রকৃত ধর্মচর্চার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ কিংবা প্রতিক্রিয়াশীলতার কোনো সম্পর্ক নেই।

যতীন সরকারের আক্ষেপ ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মন্ধতার বিরোধী যারা তারাও ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে মুক্তমতি হয়ে উঠতে পারেন না। তারা রক্ষণশীল প্রচারক ও প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মব্যবসায়ীদের হাত থেকে ধর্মশাস্ত্রকে, উদ্ধার করে আনার গরজ বোধ করেন না, নিজেরাই যে ধর্মশাস্ত্রের সঠিক ব্যাখ্যাতা হয়ে উঠবেন– এমন সাহস পান না। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন ধর্মপ্রাণ জনগণকে ধর্মধ্বজী ধর্মব্যবসায়ী ও

ধর্মতন্ত্রের উগ্রবাদ ব্যাখ্যাকারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রথমে তো বুদ্ধিজীবীদেরই ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা যে মানবতাকেন্দ্রিক এবং বাঙালির লৌকিক ধর্ম যে মুক্তবুদ্ধির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত অকাট্য যুক্তি সহকারের তা তিনি প্রমাণ করেছেন। 'বাঙালির লৌকিক ধর্মের মর্মান্বেষণ' নামক অসামান্য প্রবন্ধে তিনি উচ্চারণ করেছেন–

'... কোনো শাস্ত্রীয় ধর্মের আশ্রয়ে আদি বাঙালি জনগোষ্ঠীর যাত্রা শুরু হয়নি। তারা তখন হিন্দুও ছিল না, বৌদ্ধও ছিল না। ক্রমে বাইরে থেকে তাদের ভিতর হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এরপর এসেছে ইসলাম ধর্ম। অর্থাৎ লৌকিক ধর্মই ছিল বাঙালির স্বাভাবিক ধর্ম, পরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে শাস্ত্রীয় ধর্ম তার উপর আরোপিত হয়েছে। এরপর বাঙালি তার স্বাভাবিক লৌকিক ধর্মকে ত্যাগ করেনি। শাস্ত্রীয় ধর্মের সমস্ত বিশ্বাস ও অনুশাসনকে হুবহু গ্রহণ করেনি, লৌকিক ধর্মের জারবরসে শাস্ত্রীয় ধর্মকেও রীতিমত লৌকিক করে নিয়েছে। এভাবেই বাংলা মাটিতে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে লৌকিক হিন্দু, লৌকিক বৌদ্ধ ও লৌকিক ইসলামের প্রসার ঘটেছে।"

প্রাবন্ধিক-বুদ্ধিজীবী যতীন সরকারের অন্যতম অবদান সংস্কৃতির প্রকৃত রূপের সঙ্গে পাঠক সাধারণকে সংযুক্ত করা। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের যুগে সংস্কৃতি যখন পণ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং পণ্য ভোগবাদের (Commodity fetishicsm) রমরমা যুগে যখন সংস্কৃতি ও বিনোদন সমার্থক প্রপঞ্চকে পরিণত হয়েছে তখন তিনি চুলছেরা বিশ্লষণ করে সস্কৃতি ও বিনোদনের পার্থক্য চিনিয়ে দেন। দেশসেরা সংস্কৃতিতাত্ত্বিক তিনি, হাঙ্গেরির দার্শনিক লুকাচ সংস্কৃতিকে সকল মানবিক কর্মকাণ্ডে লক্ষ্যবিন্দু এবং রাজনীতিকে সে লক্ষ্যবিন্দুতে পৌঁছার পথ হিসেবে দেখেছিলেন। লুকাচের অনুসারী যতীন সরকার সংস্কৃতিকে রাজনীতির চূড়ায় বসিয়ে সংস্কৃতির মধ্যে যে অনুশীলনজাত মননগত উৎকর্ষ ও মূল্যবোধ রয়েছে তা দিয়ে রাজনীতিকে পরিশ্রুত করার কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন এদেশে সংস্কৃতির মহৎ মানবিক লক্ষ্যকে ছাপিয়ে উঠেছে রাজনীতির সংকীর্ণ কৌশল। তাই রাজনীতিকে পরিশোধিত করতে হলে, মুক্তিযুদ্ধের অপহৃত মূল্যবোধকে পুনরুদ্ধার করতে হলে, ধর্মাশ্রিত জঙ্গিবাদকে রুখে দাঁড়াতে হলে যথার্থ সাংস্কৃতিক জাগরণের কোনো বিকল্প নেই। এই জাগরণ শুধু শহুরে শ্রেণির মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী নয়, গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও। এই সম্মিলিত জাগরণই পারে আমাদের চেতনাগত পশ্চাৎপদতার মূল উপরে ফেলতে।

যতীন সরকারের সংস্কৃতিভাবনা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আদলে সংগঠিত। কিন্তু উদারমানবতাবাদীদের যে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রয়েছে সেটি তিনি অস্বীকার করেন না বামপন্থী সংস্কৃতি তাত্ত্বিক গোপাল হালদার, রণেশদাশ গুপ্তের চিন্তাধারাকে যেমন তিনি ধারণ করেন, তেমনি উদার মানবতাবাদী বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ,

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সংস্কৃতি ভাবনাও তাঁকে প্রাণিত করে। লোকসংস্কৃতির প্রতি তাঁর নিষ্ঠা সর্বজনবিদিত। এ বোধ থেকেই তিনি বিশ্বাস করেন জনগণের সংস্কৃতিতে। কবিগান, পালা, লোকসংস্কৃতি নায়কদের জীবনী রচনা নানাভাবে তিনি গবেষণা করে দেখিয়েছেন লোকসংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করে সংস্কৃতির মূলধারা নির্মাণ সম্ভব নয়। নাগরিক ও গ্রামীণ সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতা দূর করে একটি অখণ্ড, মননদীপ্ত, আনন্দময় সংস্কৃতির ধারা গড়ে তোলার পক্ষপাতী তিনি। তিনি যথার্থই বলেছেন–

"আমাদের দেশে নাট্যকলার মুক্তিপ্রয়াসে যারা ব্রেখট সম্পর্কে উৎসাহী, তাদের উচিত সর্বাগ্রে আমাদের আপন দেশের ঐতিহ্য ও সম্পদ মুকুন্দ দাসের প্রতি মনোযোগী হওয়া। তাহলেই বোধ হয় দৈশিক প্রেক্ষাপটে ব্রেখটীয় পদ্ধতির সুসঙ্গত প্রয়োগ সম্ভব হতে পারে, থিয়েটার আর যাত্রা তথা লোকনাট্য ও অবিজাত নাট্যের কৃত্রিম ব্যবধান ঘুচিয়ে একটা অখণ্ড গণনাট্য ও গণসংস্কৃতি সৃষ্টি হতে পারে।"

এমন ভাবনা থেকেই তিনি বাংলা কবিতার মূলধারা অন্বেষণে অসামান্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। মুকুন্দ দাস, রমেশ শীল, হাছন রাজা, শাহ জালাল উদ্দীন খাঁ, শাহ আবদুল করিমের মতো স্মরণীয় স্রষ্টাদেরকে 'লোককবি বৃত্ত থেকে মুক্ত করে মূলধারার কবির শিরোপায় ভূষিত করেছেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সাহিত্য সমালোচক ও ঐতিহাসিকদের বক্তব্যকে খণ্ডন করে বলেছেন–

"আমরা 'শিক্ষিত' মানুষজন, আসলে কতকগুলো দুর্মর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এগুলো 'আধুনিকতা'র কুসংস্কার। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাই আমাদের মস্তিষ্ককোষে সেইসব কুসংস্কার ঢুকিয়ে দিয়ে নিদারুণ মানস প্রতিবন্ধের সৃষ্টি করেছে সে রকম মানস- প্রতিবন্ধের দরুণই আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসকেও আমরা খণ্ডিত করে ফেলেছি, একটা খণ্ড অংশকেই সমগ্রে মর্যাদা দিয়েছি। বাংলা সাহিত্যের মূল ধারা বলে আমরা ধরে নিয়েছি ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের সৃষ্ট সাহিত্যকে। এর বাইরে বিশাল বাংলায় গ্রামীণ কৃষিজীবী বা অন্যান্য বৃত্তিজীবীদের মধ্যে থেকে উঠে এসেছেন যে সব কবি, শতকরা নব্বই জন মানুষ যাঁদের কবিতা বা গান তথা সাহিত্যে উপভোক্তা তাঁদের তো আমরা গণনায়কই বিবেচনা করিনি। অথচ এঁরাই আবহমান বাংলার গণকবিতার ধারা বাহিকতা ধরে রেখেছেন।"

মূলধারার এই কবিদের পথরেখা অনুসরণ করেই বাংলা সাহিত্য মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে কাজী নজরুল ইসলামের। নজরুলের সমকালে ও পরবর্তী সময়ে তাঁর অবদানকে যেভাবে খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে এর তীব্র নিন্দা জানিয়ে নজরুলের অখণ্ড সত্তাকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন যতীন সরকার।

আবহমান বাঙালির সামগ্রিক ও সমন্বয়ী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে আবির্ভূত নজরুল খণ্ডিত হয়েছেন হিন্দু, মুসলমান এমনকি বামপন্থি মহল দ্বারাও। নজরুল

সাহিত্যে যেখানে নিজেদের আদর্শ চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে, সেখানে তাদের কাছে নজরুল আদৃত হয়েছেন, অন্য ক্ষেত্রে হয়েছেন বর্জিত। এই প্রবণতার বিরোধিতা করে অখণ্ড নজরুল অনুসন্ধান প্রয়াসী হতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন–

"নজরুল ইসলাম সাধারণ মাপের খাঁটি বাঙালি কবি নন, লোকসাহিত্যের পরিমণ্ডলের বাইরে নাগরিক সমাজের কবিদের মধ্যে 'খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি' বাঙালি কবি তিনি। লোককবিদের খাঁটি বাঙালিত্বকে তাঁর সমগ্র সত্তায় ধারণ করেই তিনি গ্রাম থেকে নগরে উঠে এসেছিলেন।"

বক্তৃতায় সাক্ষাৎকারে, সাহিত্যচর্চায় যতীন সরকার যাকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করেন তিনি বাঙালি সংস্কৃতির মহত্তম পুরুষ রবীন্দ্রনাথকে অবলোকন করেছেন 'দুই বিঘা জমি'তে দাঁড়িয়ে। সমাজতন্ত্রী ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর বিশ্ব মানবতাবোধের মধ্যেই যে সাম্যচেতনা প্রবলভাবে জড়িয়ে আছে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যতীন সরকার। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন, সামাজিক বাস্তবতার একান্ত মূর্ত ও স্পষ্ট প্রকাশ এবং একই সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের আর্তি ও আকুলতার সুনিপুণ উদঘাটন'। ইতিহাস গুরু হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে বিবেচনা করেছেন লেখক। তিনি যথার্থই বলেছেন,

"...তাঁর মনীষার দীপ্তি ইতিহাসের অনেক আঁধার কক্ষকেও আলোকিত করে তুলেছে। কবিতা-উপন্যাস-নাটকের মতো সৃষ্টিশীল সাহিত্যে যেমন তিনি তীব্র ইতিহাস বোধের পরিচয় রেখেছেন, তেমনি নিছক তত্ত্ব আলোচনাতেও ইতিহাস–ব্যাখ্যার অনেক মৌলিক সূত্রের সংযোজন ঘটিয়েছেন। তাই ইতিহাসের পাঠ নিতেও যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের শিষ্যত্বকে অঙ্গীকার করে নিই, তাহলেও ঠকবার আশঙ্কা তো নেই-ই বরং লাভের সম্ভাবনা প্রচুর।"

গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার কারণে দেশের অতীত ও বর্তমান বাস্তবকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তৎকালীন রাজনীতিবিদগণ বিদেশি রাজ তাড়িয়ে স্বরাজ তথা নিজেদের রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছিলেন, জনগণের রাজত্ব নয়। রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছিলেন। লেখকের পর্যবেক্ষণ–

"রবীন্দ্রনাথ যাকে 'সমাজতন্ত্র' বলেছিলেন, সেটি ইংরেজি 'সোশ্যালিজম' এর বাংলা অনুবাদ মাত্র নয়। এই সমাজতন্ত্রে স্যোশ্যালিজম অবশ্যই অঙ্গীকৃত, সোশ্যালিজমের চেয়ে অনেক বড়। সেই সোশ্যালিজমেই ছিল আসল 'গণতন্ত্র' যে গণতন্ত্রের অবস্থান বিলিতি 'ডেমোক্রেসি'র অনেক অনেক উপরে। সে গণতন্ত্রে একালীন রাষ্ট্রতন্ত্রের ভোটাভুটি ছিল না, কিন্তু গণমানুষের প্রকৃত অংশীদারিত্ব ছিল।"

ভাববাদী কবি রবীন্দ্রনাথকে বস্তুবাদী যতীন সরকার মূল্যায়ন করেছেন প্রবল

কাণ্ডজ্ঞান থেকে। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী দর্শনের মধ্যেও তিনি খুঁজে পেয়েছেন বস্তুবাদের নির্যাস। রবীন্দ্রনাথ কল্পজগতের সৃষ্ট হয়েও রেনেসাঁসজাত মানবতন্ত্রের প্রেরণাতেই হতে পেয়েছিলেন বাস্তববাদী শিল্পী। এই বাস্তবতাবোধ তিনি আহরণ করেছিলেন বাংলার লোকায়তিক জীবনোপলব্ধি থেকে। লেখকের পর্যবেক্ষণ–

"...ভাববাদী কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ 'ভাবোন্মাদ ছিলেন না, বরং ছিলেন অনেক বস্তুবাদীর চেয়েও অনেক বেশি বাস্তব দৃষ্টির অধিকারী।... ভাববাদী পরিপার্শ্ব থেকে যাত্রা শুরু করলেও রবীন্দ্রনাথ হাঁটতে হাঁটতে যে পথে চলে গিয়েছে সে পথ মোটেই ভাববাদের নয়, শেষ পর্যন্ত বস্তুবাদের সৈদ্ধান্তিক ভূমিতেই নিজেকে তিনি উপনীত করেছেন।"

বাস্তবতাবোধের কারণেই যৌবনে 'ক্ষণিকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছিলেন, "ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে।" জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপলব্ধি করেছেন, "সত্য যে কঠিন/ কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা।" রবীন্দ্রিক সত্যনিষ্ঠাকে যতীন সরকার তাঁর জীবনদর্শনে ঐকান্তিকভাবে ধারণ করেছেন।

মনয়মনসিংহ চরিতাভিধানে যতীন সরকার সম্পর্কে বলা হয়েছে "শিক্ষাবিদ, সাম্যবাদী রাজনীতিক, সংস্কৃতি সংগঠক ও লেখক। সমাজতত্ত্বের সত্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণে তিনি পারদর্শী। সমাজ, সংস্কৃতি ও দেশের মৌলিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ গভীর। সত্য ভাষণ ও বাগ্মিতার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ।" এই বর্ণনাটুকু লেখকের যে বইটিতে সবচেয়ে যৌক্তিকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে সেটি হচ্ছে ' পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু দর্শন'।

নিম্নবর্গের ইতিহাস নিয়ে আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য চর্চা নেই। মুক্তিযুদ্ধের যে প্রথাবদ্ধ ইতিহাস সেটিও খণ্ডিত, নাগরিক জীবনের দ্বন্দ্ব সংকটের বৃত্তে আবদ্ধ, গ্রামীণ মনোলোক এখানে অনুপস্থিত। 'পাকিস্তানের জন্ম মৃত্যু দর্শন' এক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ পর্ব, দেশবিভাগ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়- এই সময়সীমার মধ্যে লোকজ ইতিহাস ও লোকজ দর্শনের সমন্বয়ে এক অনবদ্য স্মৃতিকথা আলোচ্য বইটি। যতীন সরকার ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু, রাজনৈতিক পরিচয়ে বামপন্থি এবং কর্মসূত্রে শিক্ষক। সব পরিচয়ের উর্ধ্বে ওঠে নির্মোহ বিশ্লেষণে তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন পাকিস্তানের উদ্ভব ও বিলুপ্তির অসামান্য চিত্র। বইটি পাকিস্তান পূর্ব সময়ের ও পাকিস্তান পর্বের সিকি শতাব্দীর মফস্বলবাসী হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত সমাজের স্বচ্ছ ছবিতে পূর্ণ এক চিত্রশালা। এই চিত্রশালায় ঠাঁই পেয়েছেন সাধারণের মধ্যেও অসাধারণ বহুব্যক্তি। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উত্থান কীভাবে একটি কালকে, ভূখণ্ডকে আলোড়িত করেছে এর স্পষ্ট

বিবরণ রয়েছে এ বইয়ে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উদারতা সাম্প্রদায়িকতা মানবিকতা-অমানবিক ও সত্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন প্রাঞ্জল ভাষায়। এক সাম্প্রদায়িকতা বিপরীতে কীভাবে আরেক সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হয় এর বস্তুনিষ্ঠ উদাহরণ দিয়েছেন লেখক–

"মুসলমানদের ভেতর থেকে যখন একটি শিক্ষিত ও আত্মসচেতন মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে, তখন সেই মধ্যবিত্ত তরুণরা হিন্দুদের সকল আচরণের মধ্যেই মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার প্রকাশ দেখতে পায়। তারাও মুসলিম রক্ষণশীলতার দুর্গটিকে আরো পোক্ত করে নিয়ে সেখানে বসেই হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঘৃণার তীর ছুঁড়তে শুরু করে। হিন্দু রক্ষণশীলতাই আরো যুক্তিহীন হয়ে, কিংবা অভিনব সব কুযুক্তির আশ্রয় নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের সৃষ্টি করেছিলো মুসলিম মধ্যবিত্ত তার উদ্ভব লগ্নেই এই হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। তারাও এখন এর মোকাবেলা করতে চায় মুসলিম রিভাইভ্যালিজম দিয়ে এ ধরনের সব বিভাইভ্যালিজমই অতীতের এক কল্পলোক সৃষ্টি করে তাতে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখে। মুসলিম রিভাইভ্যালিজমও তাই করেছিলো।"

উপন্যাসের স্বাদে তৈরি এই অপূর্ব স্মৃতি কথায় চিত্রিত হয়েছে বেশকিছু অনক্ষর পার্শ্বচরিত্র যাদের অসাধারণ কাণ্ডজ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে লজ্জা দেবে। '৪৭ এর দেশবিভাগ প্রান্তবর্তী জনপদে ভাষা আন্দোলনের ঢেউ, '৫৪ এর নির্বাচন, '৬৫ এর পাক ভারত যুদ্ধ, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এর সিঁড়ি বেয়ে '৭১ এর রক্তসরোবর পেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত ঘটনা পরম্পরার স্বাদু বর্ণনা এবং এর নায়ক, প্রতিনায়ক ও পার্শ্বনায়কদের নির্মোহ বিশ্লেষণ এই বইয়ের অবিস্মরণীয় সম্পদ। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চায় তাই 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন' অতুলনীয় সংযোজন।

যতীন সরকার জাতশিক্ষক। শুধু শ্রেণিকক্ষে নয়, শ্রেণিকক্ষের বাইরেও অনন্তত তিনটি প্রজন্মের শিক্ষাগুরু এই বরেণ্য বুদ্ধিজীবী। বামপন্থী তাত্ত্বিক ও সংস্কৃতি সংগঠক হওয়ার সূত্রে দেশজুড়ে নিজের বাগ্মিতাগুণে তিনি জয় করেছেন অগণিত দর্শক শ্রোতার মানসভুবন। প্রচলিত শিক্ষা ব্যস্থাকে তিনি স্টুপিড তৈরির শিক্ষা মনে করেন। এর বিকল্প হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন পাঠচক্রের সুবিশাল পরিসরকে। তিনি বিশ্বাস করেন বিশ্ববিদ্যালয়সহ যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পাঠশালার রক্ষণশীল ও ভ্রান্তিবহুল শিক্ষার খোলনলচে পাল্টে প্রকৃত শিক্ষার অধিকারী হওয়ার জন্য পাঠচক্র প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে নবজাগরণের অন্যতম অনুঘটক ছিল কিংবদন্তি শিক্ষক ডিরোজিওর হাতে গড়া ইয়াং বেঙ্গল। কলেজের নানা প্রতিবন্ধকতা ও নিষেধের কারণে কলেজ প্রাঙ্গনের বাইরে 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' স্থাপন করে তিনি মুক্তবুদ্ধিচর্চার সূচনা করেছিলেন। এই

'একাডেমিক এসোসিয়েশন' ছিল একটি পাঠচক্র এবং এখান থেকেই বাংলায় আধুনিক ধারার পাঠচক্রের সূত্রপাত যতীন সরকারের পর্যবেক্ষণ–

"পৃথিবীতে কোনো র‍্যাডিক্যাল চিন্তার উদ্ভব বা বিস্তারই পাঠশালা থেকে হয়নি, হয়েছে পাঠচক্র থেকে। পাঠচক্রের আওতায় লালিত পালিত হয়েই ক্রমে সকল বিপ্লবী চিন্তা জনসাধারণের বিপ্লবী কর্মপ্রয়াসে পরিণত হয়েছে এবং সমাজের বাঞ্ছিত রূপান্তর ঘটিয়েছে। এভাবেই মার্কস-এঙ্গেলসের বিপ্লবী চিন্তা উনিশ শতকের শেষ পর্বে রুশ দেশে মনীষী প্লেখানভের প্রবর্তনায় ছোট ছোট পাঠচক্রের মধ্যে দিয়ে বিস্তার লাভ করতে থাকে। এরপর বিশ শতকের গোড়াতেই পাঠচক্রের সীমানা উল্লঘন করে বিপ্লবী ভাবনার সেই স্ফুলিঙ্গগুলি লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকদের হাতে বিপ্লবের অগ্নিমশাল হয়ে জ্বলে ওঠে। এবং ক্রমে সে আগুন ছড়িয়ে যায় সবখানে।"

পাঠচক্র সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখে তিনি দায়িত্ব শেষ করেননি। ময়মনসিংহের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী মহানগরে দীর্ঘ চার দশক পাঠচক্র আন্দোলনে অভিভাবক সুলভ দায়িত্ব পালন করেছেন।

যতীন সরকারের সাম্প্রতিক প্রবন্ধ সংকলন 'সাঁকো বাঁধার প্রত্যয়'। সূচনা প্রবন্ধটি তিনি লিখেছেন শামসুর রাহমানের একটি বিখ্যাত কবিতাকে অবলম্বন করে। 'বাঁধতে পারিনি কোনো সাঁকো' নামক এই কবিতায় কবি আক্ষেপ করে বলেছেন একাকীত্বের যন্ত্রণায় তিনি রক্তাক্ত হচ্ছেন। শুধু নিজের সঙ্গে কথোপকথনের মেতে থাকা যায় না। অন্য কারো হাত অন্য কারো স্বরের জন্য ব্যাকুল কবি কারো সঙ্গেই সাঁকো বাঁধতে পারেননি। বিচ্ছিন্ন কবির স্বীকারোক্তি 'নিপুণ বাঁধতে গিয়ে সাঁকো তবু আমি/ ব্যর্থ হয়ে যাই/ বারবার ব্যর্থ হয়ে যাই...।"

এই কবিতার নির্যাসকে কেন্দ্র করে যতীন সরকার অত্যান্ত চিন্তা উদ্দীপক প্রবন্ধটি লিখেছেন। কবি, শিল্পী তথা সৃষ্টিশীল মানুষ তাদের সৃষ্টি কর্মের সঙ্গে জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত সংযোগ সেতু রচনা করতে কেন ব্যর্থ হলেন এর চুলচেরা বিশ্লেষণ রয়েছে এই প্রবন্ধে। বাংলা কবিতার যুগ পরিক্রমা করে তিনি দেখিয়েছেন আমাদের সাহিত্যের মহৎ শিল্পীদের একটি বড় অংশ সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাঁকো বাঁধতে ব্যর্থ হয়েছেন। শুধু ব্যর্থ হননি, অনেকে সাঁকো বাঁধার অঙ্গীকারকেই অস্বীকার করেছেন। 'শিল্পের জন্য শিল্প' অর্থাৎ কলাকৈবল্যবাদী জীবনদর্শনের কারণে তাঁরা গণচেতনাকে ধারণ করতে পারেননি। এমনকি বাংলার সাম্যবাদী কবিগণও বহু কাঙ্ক্ষিত সাঁকোটি বাঁধতে পারেননি কবিতার মধ্যে দিয়ে তাঁরা বড়জোর মধ্যবিত্তের এক অংশের বিবেককে জাগ্রত করতে পারলেন, শ্রমঘনিষ্ঠ জনগণের মনের অন্তরমহলে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হলেন।

এই ব্যর্থতা শুধু কবিদের নয়, সামগ্রিকভাবে আমাদের সাহিত্যের অধিকাংশ স্রষ্টাদেরও। সেই ব্যর্থতার দায় মোচনে যে বিরল সংখ্যক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী অগ্রণী

ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে যতীন সরকার অন্যতম। প্রাকৃতজন তথা সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সপক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর তিনি। শুধু সাহিত্যচর্চায় নয়, নিজের জীবনাচরণেও শ্রেণিবৈষম্যের বিলোপ তথা নিম্নবর্গের মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন তিনি। গণচেতনাকে ধারণ করতে পেরেছেন বলেই 'প্রাকৃতজনের জীবনদর্শন' নামক অসাধারণ বইটিতে তিনি উচ্চারণ করেছেন–

"যুক্তি দ্বারা কারণ থেকে কার্যে এবং কার্য থেকে কারণে পৌঁছবার নামই দর্শন', কিংবা 'দর্শন হলো কার্যকারণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান'– দর্শনের পণ্ডিতজন সমর্থিত এ রকম বিশেষ অর্থগুলো লক্ষ্য করলেও প্রতীতী জন্মে যে, কোনো বিষয়কে ভালো করে দেখা বা দেখতে চাওয়াই আসলে দর্শন। গ্রিক ভাষা থেকে গৃহীত ইংরেজি Philosophe কথাটার যে আক্ষরিক অর্থ 'জ্ঞানানুসন্ধান; তাতেও এই 'ভালো করে দেখা'র ব্যঞ্জনাটাই উপস্থিত। প্রাকৃতজনও অবশ্যই তাদের নিজেদের সাধ্যমতো পরিপার্শ্বের বা জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়কে ভালো করে দেখতে চায়, সেসব বিষয়ের কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বার করতে চায়। এই চাওয়ার আর্তি থেকেই গড়ে ওঠে প্রাকৃতজনের দর্শন। বিদগ্ধ পণ্ডিতজনের নিটক তা যতই হোক না কেন অবজ্ঞার বিষয়। এই হিসেবে বাংলা প্রাকৃতজনের নিশ্চয়ই দর্শন আছে। তবে সেটি বিদগ্ধজনের দর্শনের তো নিছক বিশুদ্ধ জ্ঞানানুসন্ধান নয়, যে কঠোর শ্রম দিয়ে প্রাকৃতজন জীবিকা অর্জন করে সেই শ্রম প্রক্রিয়ার সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত তার দর্শন।"

নিজের অর্ধশতাব্দীর সাহিত্যসাধনার সঙ্গে যতীন সরকার যুক্ত করতে চেয়েছেন প্রাকৃতজন তথা গণমানুষের চৈতন্যকে। শিল্পের সঙ্গে জীবনের সাঁকো বাঁধার প্রত্যয়ে অদম্য ক্রিয়াশীল তিনি। শ্রমঘনিষ্ঠ জনগণের সঙ্গে শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটানোর ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রত্যয়ী তাঁর বিবেক। সাঁকো বাঁধার নিপুণ কারিগর তিনি।

মুহম্মদ রিয়াজুল ইসলামের জীবন ও কর্ম

মান্নান ফরিদী

মুহম্মদ রিয়াজুল ইসলামের জন্ম ১৯৪১ সালের ১লা মার্চ, জামালপুর জেলার অন্তর্গত মেলান্দহ উপজেলার হরিনাপাই গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মরহুম মৌলভী তমিজ উদ্দিন আহমদ, মাতার নাম সালেহা খাতুন। পিতা একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মাতা গৃহিনী। পিতা-মাতার পাঁচ ছেলে ও চার মেয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় সন্তান।

পারিবারিক জীবনে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে বড় ভাই স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ছোট ভাই রফিকুল ইসলাম ব্র্যাকের চিফ ট্রেনার ছিলেন। আরেক ভাই ডা. সাইফুল ইসলাম সেনাবাহিনিতে বিগ্রেডিয়ার জেনারেল হিসেবে চাকরি জীবন শেষ করেন।

এই বরেণ্য ব্যক্তির স্ত্রী দীর্ঘদিন যাবত পঙ্গু জীবন যাপন করছেন। তাঁর চার ছেলে মধ্যে দ্বিতীয় ছেলে অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন। বেঁচে আছেন তিন ছেলে।

তিনি হাজরা বাড়ী হাই স্কুল থেকে ১৯৫৬ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন। তারপর ময়মনসিংহে চলে এসে নাসিরাবাদ কলেজে ইন্টামিডিয়েটে ভর্তি হন। ঐ কলেজ থেকে ১৯৫৮ সালে কৃতিত্বের সাথে ইন্টামিডিয়েট পাশ করেন। আনন্দ মোহন সরকারি কলেজ থেকে ১৯৬০ সালে বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে প্রাচ্যের অক্সফোর্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও ভাষায় এম. এ. ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজে বাংলা বিভাগের প্রভাষক পদে যোগদান করেন। একই প্রতিষ্ঠানে সুনামের সাথে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থেকে ২০02 সালে অবসরে যান। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও বহুভাষাবিদ অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোড়াইশী এবং বরেণ্য বুদ্ধিজীবী লেখক বাম রাজনীতিবিদ অধ্যাপক যতীন সরকারের সান্নিধ্যে থেকে একই বিভাগে কাজ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেন। সমাজে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে তিনি সফলতা লাভ করেছেন দীর্ঘ কর্মজীবনে। নাসিরাবাদ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। চাকরি জীবনের শেষের দিকে তিনি সফলতার সাথে উক্ত কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেছেন।

অধ্যাপক মুহম্মদ রিয়াজুল ইসলাম ছাত্রজীবন থেকেই বাম রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। শিক্ষকতা জীবনেও তিনি বাম রাজনীতি করতেন। ১৯৭২ সাল

থেকে সক্রিয়ভাবে (ন্যাপ মোজাফফর) রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৭৩ সালে মেলান্দ-মাদারগঞ্জ কমিনিস্ট পার্টি থেকে জাতীয় নির্বাচনে ন্যাপের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পরাজিত হন। ন্যাপ মোজাফফর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে রাজনৈতিক অঙ্গনে গরিব মেহনতি মানুষের জন্য কাজ করেন। ১৯৮১ সাল থেকে ক্ষেত মজুর সমিতির জেলা নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভূমিহীনদের জন্য সংগ্রাম করে এক একর ভূমি প্রদানের আন্দোলনে সাফল্য লাভ করেন। রাজনৈতিক জীবনে জিয়াউর রহমানের শাসনকালে দু'বার এবং এরশাদ শাসন আমলে একবার কারা ভোগ করেন।

১৯৯৪ সাল থেকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালেও ১৯৯৬ সাল থেকে আওয়ামী গড়ানার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তিনি ময়মনসিংহ শহরে একজন সুধীজন হিসেবে বহুল পরিচিতি লাভ করেছেন।

তিনি ১৯৬৭ সাল থেকে শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৮৫ সাল থেকে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন এবং তাঁরা কয়েকজন বিশেষ করে অধ্যাপক আখতার জজ খানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি একটি বিশিষ্ট সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং শিক্ষক আন্দোলনকে একটি উচ্চতায় নিয়ে যান।

এখানে বলা যায় এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি ভারতে বেঙ্গলুরে ১৯৯৬ এবং দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষকদের সাথে পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক ছিলেন। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি নিজ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করে প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য যুবকদের তিনটি দলকে ভারতে পাঠাতে সক্ষম হন। তাঁদের মধ্যে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং বাকিরা নিজ এলকায় ফিরে আসেন। অধ্যাপক রিয়াজুল ইসলাম যুদ্ধকালীন সময়ে মাঝেমধ্যে অতি সংগোপনে ময়মনসিংহে কর্মস্থলে আসতেন এবং এখানকার খোঁজ খবর নিয়ে আবার নিজ এলাকা জামালপুরে চলে যেতেন। রাজাকার আলবদর বাহিনি তাঁকে মারার জন্য খুঁজে ফিরতো। জামালপুর শহরেও তিনি নিরাপদ ছিলেন না বলেই ময়মনসিংহে চলাচলের সময়ে তিনি খুব সাবধানতা অবলম্বন করতেন। রাজাকারদের ভয়ে তিনি ট্রেনে চলাচল করতেন না। গ্রামের ভিতর দিয়ে রিক্সায়

অথবা বাসে ময়মনসিংহে আসতেন। উঠতেন সহকর্মী অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরাইশীর বাসায়।

তিনি কলেজে অধ্যাপনা ও ব্যক্তি জীবনে রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে যুক্ত থাকার পরও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৬৭ সাল থেকে সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬৯ সালে সত্যেন সেন এবং রণেশ দাশগুপ্তের হাতে গড়া উদীচী'র সঙ্গে যুক্ত থেকে ময়মনসিংহের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সাড়া ফেলে দিতে সক্ষম হন।

তিনি ছোট বেলা থেকেই আবৃত্তি এবং নাটকে অংশগ্রহণ করে আসছেন এবং নিজে ছোট একটি একাঙ্কিকা লিখে নাসিরাবাদ কলেজ ছাত্রদের নিয়ে নাটকটি মঞ্চস্থ করান।

তিনি দীর্ঘদিন ময়মনসিংহের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম ইনস্টিটিউটের গুরুত্বপূর্ণ পদে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থেকে এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রয়াস গ্রহণ করেন।

অপরদিকে ১৯৭২ সাল থেকে ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের সঙ্গে যুক্ত থেকে ক্লাবের উন্নতির জন্য শ্রম এবং মেধা নিয়োগ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রেসক্লাবের প্রথম একতলা ভবনটি নির্মিত হয়। ক্লাবের সদস্যগণ তাঁকে ভালোবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন। তিনিও ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন।

বর্তমানে তিনি ময়মনসিংহ শহরের আকুয়া দক্ষিণ পাড়া, দরবার শরিফ রোডে ১৯৮০ সালে নির্মিত একতলা নিজ বাসভবনে অসুস্থ স্ত্রী ও সন্তানাতিদের নিয়ে বসবাস করছেন।

গোলাম সামদানী কোরায়শী প্রসঙ্গে
আতাউল করিম

গোলাম সামদানী কোরায়শী ছিলেন একজন বড় মাপের পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। অনেকগুলো ভাষায় ছিল তাঁর দখল এবং সেইসব ভাষার শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস এবং দর্শনে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি সেই ভাষায় রচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি ছিলেন একজন সফল অনুবাদক। একজন দার্শনিক। একজন ইতিহাসবিদ। একজন সৃজনশীল লেখক, উপন্যাসিক, ছড়াকার, শিশুসাহিত্যিক।

তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের গবেষক। তিনি একাধারে ছিলেন একজন শিক্ষক এবং শিক্ষক সমাজের অধিকার আদায়ে নেতৃত্ব দানকারী। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সামাজিক নেতা, মুক্ত সাংবাদিক, একজন দক্ষ সংগঠক এবং দেশ ও জাতির সংকটময় মুহূর্তে শিল্প সাহিত্যের অঙ্গনে সম্মুখ সারির একজন নেতৃত্ব দানকারী।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব গোলাম সামদানী কোরায়শী বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং একুশ শতকে শুরুতে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডে মানুষের সংকটাপন্ন সময়ে নিজের বহুমুখী প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে মানব কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য রেখে গেছেন তাঁর বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ।

ছাত্রজীবন শেষ করে যে কাজটি দিয়ে গোলাম সামদানী কোরায়শী তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন, সেই কর্মসূচনা সময়ের অবদানকে তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মগুলোর একটি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যে মাস্টার্স পরীক্ষার পরপরই তিনি নিয়োগ পেলেন বাংলা একাডেমিতে আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের সহকারী সম্পাদক হিসেবে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তখন এর সম্পাদক। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের বয়স তখন পঁচাত্তর বছর। অভিধানটি সম্পাদনার কাজে গোলাম সামদানী কোরায়শী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ পান। যার স্বীকৃতি অভিধানটিতেই উল্লেখ রয়েছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সাথে কাজ করার সুযোগটি কীভাবে ঘটেছিল তার প্রেক্ষাপট তিনি আত্মজীবনী 'সিন্ধুর এক বিন্দু'তে বর্ণনা করেছেন।

তিনি লিখেছেন, 'এমন সময় রফিকের নিকট থেকে একটি পোস্টকার্ড পেলাম। কুশল জিজ্ঞাসার পর একটিমাত্র সংবাদ, শহীদুল্লাহ্ সাহেব আমাকে যেতে বলেছেন।

পরদিনই ঢাকা রওনা হয়ে গেলাম। কারণ, শহীদুল্লাহ্ সাহেবের এই স্মরণ করার ব্যাপারটি আকর্ষণীয় কিছু হবে বলেই আমার মনে হলো। ইতিপূর্বে ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত যেভাবে হয়েছিল, তাও যদি হয়, তাহলেও এর প্রতি লোভ আমার কম নয়। এছাড়া অন্তরঙ্গতা বাড়লে চাকরিরও একটা হিল্লা হয়ে যেতে পারে। সুতরাং দুপুরবেলা গিয়ে রফিকদের বাসায় উঠলাম। কিন্তু রফিকের সাথে আলোচনা করেও প্রয়োজনের কোন হদীস পেলাম না। বিকালে রফিককে সাথে নিয়ে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের চক বাজারের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলাম।

তখন আছরের নামাজ পড়ে শহীদুল্লাহ্ সাহেব বৈঠকখানাতেই বসেছিলেন। আমাকে দেখেই উঠে পড়লেন। ভেতরের দিক থেকে একটি ফাইল নিয়ে এসে পাতা উল্টিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাকে স্মরণ করেছি একটা শব্দের জন্য।

কিন্তু আমি মাঝপথে বাধা দিয়ে বললাম, আমাকে আপনি বলবেন না, স্যার! কারণ আমি আপনার ছাত্রের ছাত্র। তা ছাড়া আমি রফিকের সহপাঠী।

তিনি আমার বক্তব্য শুনে মুচকি হাসলেন। বললেন, ঠিক আছে, এখন একটা শব্দ শোনো : 'আবেন্দা' শব্দটা কোন ভাষার হতে পারে ?

আমি প্রায় বিনা দ্বিধায় বলে ফেললাম, ফারসি; অর্থ-আনয়নকারী।

তিনি আমার কথা শুনে ফারসি অভিধান খোঁজার জন্য উঠে গেলেন। আর আমি বসে বসে ঘামতে থাকলাম। হাঁ, শব্দটার জন্যেই। কারণ, এই একটা শব্দের জন্য যদি সেই ময়মনসিংহ থেকে আমাকে এখানে আসতে হয়ে থাকে, তা হলেই চিত্তির ! আর শব্দটা ভুল হলেতো কথাই নেই; আমার অযোগ্যতাও সেই সাথে নিরূপিত হয়ে যাবে। কিন্তু না, একটু পরেই তিনি 'লুগাতে কেশোয়ার' থেকে শব্দটি বের করে আমাদের কাছে ফিরে এলেন। শুধু শব্দ নয়, আমার দেয়া অর্থও মিলে গেছে। শব্দটি যশোর অঞ্চলে বিয়ের ঘটক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে শব্দটি এসেছে। তিনি যথাস্থানে শব্দটির ব্যুৎপত্তি লিখে নিয়ে আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন। তাঁর চোখে মুখে একটা সন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, তুমি কোথায় উঠেছো?

আমি রফিকের কথা বললে তিনি বললেন, কাল একবার একাডেমিতে আমার সাথে দেখা করো। পরদিন গেলাম একাডেমিতে। আমি একাই ছিলাম। গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি হাতের ইশারায় আমাকে বসতে বললেন। একটা কিছু বোধ হয় লিখছিলেন, সেটি শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার সাথে এসো।

আমি তাঁর পিছু পিছু তৎকালীন পরিচালকের (এখন এ পদের পদবি মহাপরিচালক) কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন পরিচালক ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। তাঁর সাথে আমার কোনো পরিচয় ছিলো না। সুতরাং আমি অত্যন্ত

সংকোচের সাথে সেখানে প্রবেশ করলাম। তিনি পরিচালকের কাছে তাঁর সহকারীদের নিয়োগের ব্যাপারে জানতে চাইলেন। পরিচালক জানালেন যে, সরকারী কলেজের দু'জন অধ্যাপককে এ ব্যাপারে আনার জন্য যথারীতি লেখা হয়েছে। খুব শীগগিরই সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। শহীদুল্লাহ্ সাহেব সব শোনার পর বললেন, তুমি কাকে এনে দেবে? তার দ্বারা কতোটুকু কাজ হবে, কিছুই বুঝার উপায় নেই। আমি বলছি, তুমি একে নিয়োগ দিয়ে দাও।"

গোলাম সামদানী কোরায়শী এই নিয়োগ নিয়ে জটিলতার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে তাঁর আত্মজীবনীতে আরও লিখেছেন, "এর মধ্যে আবার রফিকের পোস্টকার্ড এসে উপস্থিত। সংবাদটি হলো, তোর চাকরি হয়ে গেছে।

আমার গাঁটরী বাঁধাই ছিলো। পরদিনই ঢাকা গিয়ে উপস্থিত হলাম। সে দিনটি ছিলো ২৬শে ফেব্রুয়ারি। রফিককে সাথে নিয়ে বিকালে গেলাম ডক্টর সাহেবের ওখানে। তিনি দেখেই বললেন, কালই একাডেমিতে এসো, তোমার নিয়োগপত্র দেয়া হবে।

আমি নীরবে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। পথে রফিককে বললাম, কী হয়েছিল রে? হঠাৎ এমন নিয়োগপত্র দেয়া হচ্ছে !

রফিক বললো, বুড়ো রাগ করে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছিলো। তাই সৈয়দ সাহেব বুড়োর রাগ থামানোর জন্য তোকে চাকরি দিতে বাধ্য হয়েছে।

পরদিন ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১ সন, আমি বাংলা একাডেমির আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রকল্পের সহকারী সম্পাদক হিসেবে আমার নিয়োগপত্র পেলাম। আমার বেতন নির্দিষ্ট হলো ৬০০ টাকা।"

আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের কর্ম অভিজ্ঞতা নিয়ে গোলাম সামদানী কোরায়শী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "ইতিমধ্যে একাডেমিতে আমি আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের সম্পাদনার কাজ আরম্ভ করেছি। আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে, এই সম্পাদনার কাজে শহীদুল্লাহ্ সাহেব আমাকে মাত্রাতিরিক্ত দায়িত্ব ও গুরুত্ব দিতে আরম্ভ করেছিলেন। এর ফলে আমার সহকর্মী দু'জনের কাজও চূড়ান্তভাবে আমাকে দেখে দিতে হয়েছে। কারণ সংগৃহীত শব্দাবলীর মধ্যে অনেক শব্দই আরবি ফারসি শব্দজাত ছিলো। সেগুলির ব্যুৎপত্তি নির্দেশে আমার ভাষা জ্ঞান কাজে লেগেছে। সুতরাং আমার সহকর্মীরাও এ ব্যাপারে আমার উপর নির্ভর না করে পারেনি। এমন কি কিছু সময়ের জন্য আমার শিক্ষক অধ্যাপক আমিনুল ইসলামও আমার সহকর্মী হয়েছিলেন। তিনি কানাডার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সমাজবিজ্ঞানে অধ্যাপনা করতেন। এখানে ছুটিতে এসে হঠাৎ আমার সহকর্মী হয়ে দাঁড়ান। তাঁর করিৎকর্মা চরিত্রের কথা আমার শিক্ষা জীবনেও আমি বলেছি। এবারও দেখলাম, তাঁর সেই

স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি। এমনকি, যে কিছুদিন ছিলেন, সেই প্রবন্ধের মতো সম্পাদনাতে আমার সাহায্য অম্লান বদনে গ্রহণ করেছেন।"

গোলাম সামদানী কোরায়শী'র জীবনের আরও একটি অন্যতম কীর্তি হচ্ছে, ত্রয়োদশ শতকের বিখ্যাত গ্রন্থ ইবনে খালদুনের 'আল মুকাদ্দিমা' সরাসরি আরবি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ। হিস্টিরিওগ্রাফি কিংবা সোসিওলোজির মতো জ্ঞানের অনেক শাখার আকরগ্রন্থ এই বইটি। বাংলা ভাষার রচনাবলিতে এই গ্রন্থটি যুক্ত হওয়ায় বাংলা ভাষার মর্যাদাই যে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২০১৮তে দিব্য প্রকাশ প্রকাশনী থেকে পূর্বে প্রকাশিত বইটির নতুন সংস্করণের ফ্ল্যাপের লেখাটি এখানে উদ্ধৃত করছি। "তিলতিল অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'কিতাবুল ইবার' লিখতে বসলেন। কী গভীর আবেগ ও ঐকান্তিক প্রেরণা এ সময়ে তাঁর সমগ্র চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এর পরিচয় তিনি আত্মজীবনীতে তুলে ধরেছেন। খালদুন লিখেছেন, 'এক সর্বগ্রাসি মহৎ অনুপ্রেরণায় বুঁদ হয়ে আমি আমার পরিকল্পিত ইতিহাসের ভূমিকা শেষ করেছি এবং এটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অদ্ভুতভাবে সে নিজেই তার শব্দ ও অর্থের যোগান দিয়ে গেছে।' এই ঘটনার পর 'কিতাবুল ইবার' নামক বিশ্ব ইতিহাস তিনটি গ্রন্থে সাতটি খণ্ডে সমাপ্ত করতে আরও চার বছর লেগেছিলো।

১৩৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ইবনে খালদুন তাঁর 'কিতাবুল ইবার' গ্রন্থের ভূমিকা 'আল-মুকাদ্দিমা' লেখা শেষ করেন। আল-মুকাদ্দিমা শব্দের অর্থ ভূমিকা। তাঁর জীবদ্দশাতেই সমগ্র গ্রন্থটির চেয়ে এর ভূমিকা আল-মুকাদ্দিমা বেশী বিখ্যাত হয়ে ওঠে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী এটি মানব সভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোর একটি হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। বিখ্যাত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েন্বি আলমুকাদ্দিমা সম্পর্কে লিখেছেন, "নিঃসন্দেহে এটি এই ধারার শ্রেষ্ঠ কীর্তি, যা আজ পর্যন্ত কোথাও কোন প্রতিভাবান সৃষ্টি করেননি।" হিস্টিরিওগ্রাফি, সোসিওলজি, ইকোনমিক্স, ডেমোগ্রাফি, পলিটিকেল সায়েন্স ইত্যাদি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আঁতুরঘর এই গ্রন্থটি। ইবনে খালদুনের জন্ম ১৩৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ মেতিউনিসে এবং মৃত্যু ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মার্চ কায়রোতে। শৈশব কৈশোর কেটেছে তিউনিসে। জীবনের শেষ তেইশটি বছর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে এবং প্রধান বিচারপতি হিসেবে মিসরেই কাটিয়েছেন। মিসরের বিখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা কালেই তাঁর জ্ঞান ও বাগ্মিতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর পূর্বপুরুষ অষ্টম শতাব্দিতে মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের সময়ে দক্ষিণ আরব থেকে স্পেনে আসেন। স্পেনের পতনের অনেক আগেই তারা স্পেন ছেড়ে তিউনিসে চলে আসেন। ইবনে খালদুন 'আল-মুকাদ্দিমা' বইটি লিখেছিলেন আরবি ভাষায় এবং ১৯৩০ সনে এটি তুর্কি ভাষায় অনূদিত হয়ে আন্তর্জাতিক সমাদর

লাভ করে। ফারসিতে অনূদিত হয় ১৮৮২ সনে। ১৯৫৮ সনে ফ্রেঞ্চ রোজেনথাল এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে আমেরিকায় প্রকাশ করেন। বহুভাষাবিদ পন্ডিত গোলাম সামদানী কোরায়শী মূল আরবি থেকে গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন, যেমন তিনি এর আগে মূল ফারসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন জিয়া উদ্দিন বারাণির ত্রয়োদশ শতকে লেখা ইতিহাস গ্রন্থ তারিখ-ই-ফিরুজশাহী। তবে এই গ্রন্থের টীকাভাষ্য এবং অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে তিনি রোজেনথালের ইংরেজি অনুবাদটির ও সাহায্য গ্রহণ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন। ২০১৫ সনের নববর্ষ শুভেচ্ছায় ফেসবুক সিইও মার্ক জুকারবার্গ আজকের আধুনিক মানুষের আবশ্যিক পাঠের জন্য এগারোটি বইয়ের সুপারিশ করে বলেছেন চতুর্দশ শতকে লিখিত হলেও ইবনে খালদুনের আল-মুকাদ্দিমা এখনও সচেতন মানুষের অবশ্য পাঠ্যগন্থ।"

গোলাম সামদানী কোরায়শীর জীবনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ত্রয়োদশ শতকের আত্মজীবনীমূলক ইতিহাস গ্রন্থ জিয়াউদ্দিন বারানীর তারিখ-ই-ফিরুজশাহী। বাংলাদেশ বা ভারতের ইতিহাস কখনও সম্পূর্ণভাবে লেখা সম্ভব নয় এই গ্রন্থটির সাহায্য ছাড়া। কবি আমির খসরুর উত্থান ও বিকাশ, নিজামউদ্দিন আওলিয়ার সময়কাল, ইবনে বতুতার সফর, বাংলার স্বাধীন সুলতানদের উত্থান, ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে বাংলা এবং ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে ইতিহাসের এই আকর গ্রন্থটি অবশ্যই পাঠ করতে হবে। মূল ফারসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে গোলাম সামদানী কোরায়শীই এটি বাংলা ভাষার পাঠকের হাতে পৌঁছে দেন। গ্রন্থটির অনুবাদ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "আমি তখন আরও একটি অনুবাদের কাজ আরম্ভ করেছি। মূল ফারসি থেকে তারিখ-ই-ফিরুজশাহী অনুবাদ করছি। ব্যাপারটা একাডেমির অনুবাদ বিভাগের, অনেকটা জোর করেই আমার উপরে চাপানো হয়। এ সময় আবু জাফর শামসুদ্দিন সাহেবের সাথে পরিচয়টা আরও ঘনিষ্ঠ হয়। তিনিই আমাকে বলেন যে, কাজটি আরও দু'তিন জনকে দিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, সুতরাং আমি ছাড়া কোন গতি নাই। কারণ ইতিপূর্বে আমি কালিলা ও দিমনা নামে যে অনুবাদটি করেছি, তার মূল একটি ফারসি গ্রন্থ, এমনকি ইকবালের কাব্যানুবাদটিও ফারসি থেকে করা। কাজেই একাজ আমিই করতে পারবো। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এসব অনুবাদ করতে গিয়ে আমার ফারসি জ্ঞান পদে পদে ব্যাহত হয়েছে। তবু একটা অসাধারণ গোঁ ছিল বলেই বুঝি আমি অমানুষিক পরিশ্রম করে এই পুরাতন ফারসি ভাষার অর্থ উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। কারণ ফারসি-বাংলা কোনো অভিধান তখনও ছিলো না, এখনও নেই।"

গোলাম সামদানী কোরায়শীর সমগ্র রচনাবলি এখনও প্রকাশিত হয়নি। তাই কোন গবেষক চাইলেও তার গ্রন্থ নিয়ে গবেষণার সম্পূর্ণ সুযোগ পাবেন না, বিশেষত

তাঁর মৌলিক চিন্তাকে ধারণ করছে যে বইগুলো, কিংবা তাঁর সৃজনশীল চিন্তাকে ধারণ করছে যে বইগুলো। তাঁর প্রধান প্রধান কয়েকটি বইয়ের নাম এবং সম্ভব মতো প্রকাশকের নাম এখানে উল্লেখ করছি। আত্মজীবনী : সিন্ধুর এক বিন্দু (সূচীপত্র), অনুবাদ : ইবনে খালদুনের আল-মুকাদ্দিমা (বাংলা একাডেমি এবং পরে দিব্য প্রকাশ), জিয়া উদ্দিন বারানীর তারিখ-ই-ফিরুজশাহী (বাংলা একাডেমি এবং পরে দিব্য প্রকাশ), ইকবালের আরজুগানে হিজাজ (ইকবাল একাডেমি), আনোয়ারে সুহায়লী নামক বিখ্যাত ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ কালিলা ও দিমনা (বাংলা একাডেমি)। প্রবন্ধ : আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (বাংলা একাডেমি), সাহিত্য ও ঐতিহ্য (মুক্তধারা), ইসলাম ও আমেরিকা (জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী), আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ইসলাম (সূচীপত্র), ঐতিহ্য অন্বেষা, পিতৃভাষা, আসামীর কাঠগড়ায়। জীবনী : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (শিশু একাডেমি), ছোটদের দুদুমিয়া (শিশুএকাডেমি)। ছড়া : গোবদা সাধুর কোর্তা, ওলটপালট, আগডুমবাগডুম। সেমেটিক মিথোলজি অবলম্বনে উপন্যাস : স্বর্গীয়অশ্রু মহাপ্লাবন, পুত্রোৎসর্গ, চন্দ্রাতপ, ষষ্ঠীমায়া।

এর বাইরেও তাঁর প্রচুর লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং লিটল ম্যাগাজিনে ছড়িয়ে আছে, এগুলো সংগ্রহ করে ছাপলে বেশ কয়েকটি বই হতে পারে। তিনি একসময় অধ্যাপনা পেশার পাশাপাশি সাংবাদিকতাও করেছেন। ময়মনসিংহ জেলা পরিষদে থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা ময়মনসিংহ বার্তা অনেক বছর চালিয়ে গেছেন স্বেচ্ছাসেবামূলক দায়িত্ব হিসেবে। ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ 'ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি' এবং 'ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা' মূলত তাঁরই পরিকল্পনা এবং প্রাথমিক উদ্যোগ। তিনি ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের সাময়িকী অরণি'ও সম্পাদনা করেছেন। একসময় সারা দেশের শিক্ষকদের নেতা হিসেবে বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাংলা একাডেমির চাকুরি তার প্রথম পেশা। এরপর ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়ে শেষজীবন পর্যন্ত সেখানেই চাকরি করেছেন। তাঁর ছাত্রজীবন ছিল অত্যন্ত অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ এবং সংগ্রামমুখর। ছোটবেলায় তাঁর স্কুলশিক্ষক পিতা নেত্রকোনায় শিক্ষকতার পেশায় থাকাকালীন মৃত্যুবরণ করলে আত্মীয় স্বজনেরা তাদের জমিজমা এবং সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে। তাঁর মাকে পুণরায় বিয়ে দিয়ে তাদের ভাইবোনদের বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। তিনি হয়ে যান নেত্রকোনার তলার হাওরে গরুর রাখাল। তিনি তখন এতোটাই অন্ধকারে নিমজ্জিত যে, তাঁর চৌদ্দ বছর বয়সে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছিল, গ্রামের মাঠে বসে যুদ্ধের বিমানগুলোকে উড়ে যেতে দেখলেও জানতেন না সেই মহাযুদ্ধ সম্পর্কে। পিতার এক বন্ধুর সাহায্যে সেই দুর্গম

গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে বিনা অর্থে লেখাপড়ার সুযোগ হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষা শুরু করেন এবং অন্যের বাড়িতে লজিং থেকে তাদের ছেলে-মেয়েদের পড়িয়ে নিজের আহারের সংস্থান করতেন। কিন্তু এমন অবস্থায়ও তিনি শিক্ষা গ্রহণের এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে আরবি, ফারসি, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী 'মুমতাজুল মুহাদ্দেসিন' বা টাইটেল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। এরপর আবার শুরু করেন ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা। নাসিরাবাদ কলেজের ছাত্র হিসেবে সে সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যয়ন করেন এবং বাংলা সাহিত্যে বিএ অনার্স এবং এমএ ডিগ্রী অর্জন করেন।

তিনি জাতির বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর সাংগঠনিক ভূমিকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ময়মনসিংহে বুদ্ধিজীবী সংগ্রাম শিবিরের সভাপতি হিসেবে ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন, পঁচাত্তর-ছিয়াত্তরের দু:সময়ে ময়মনসিংহের বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি, নব্বই এর গণঅভ্যুত্থানের সময় ময়মনসিংহে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নব্বই এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ।

তিনি তাঁর মাতুলালয়ে, নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার কাউরাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ২১শে চৈত্র, যা ৫ এপ্রিল ১৯৩০ খৃস্টাব্দ, যদিও নেত্রকোণা শহরে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত তাঁর পিতার আদি নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলায়। আলোকিত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রায় ৬১ বছরের জীবন অতিবাহিত করে ইহলোক ত্যাগ করেন ১৩৯৮ বঙ্গাব্দের ২৬শে আশ্বিন যা ১১ অক্টোবর ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ।

তিনি লেখক হিসেবে বেশ কিছু স্বীকৃতি এবং পুরস্কার লাভ করেছিলেন জীবদ্দশাতেই। তবে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার স্বাধীনতা পদক লাভ করেন মৃত্যুর প্রায় ২৬ বছর পর ২০১৭ সনে।

নাসিরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
ময়মনসিংহ
ছাত্রসংসদ, রাজনীতি ও
ধূমপানমুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

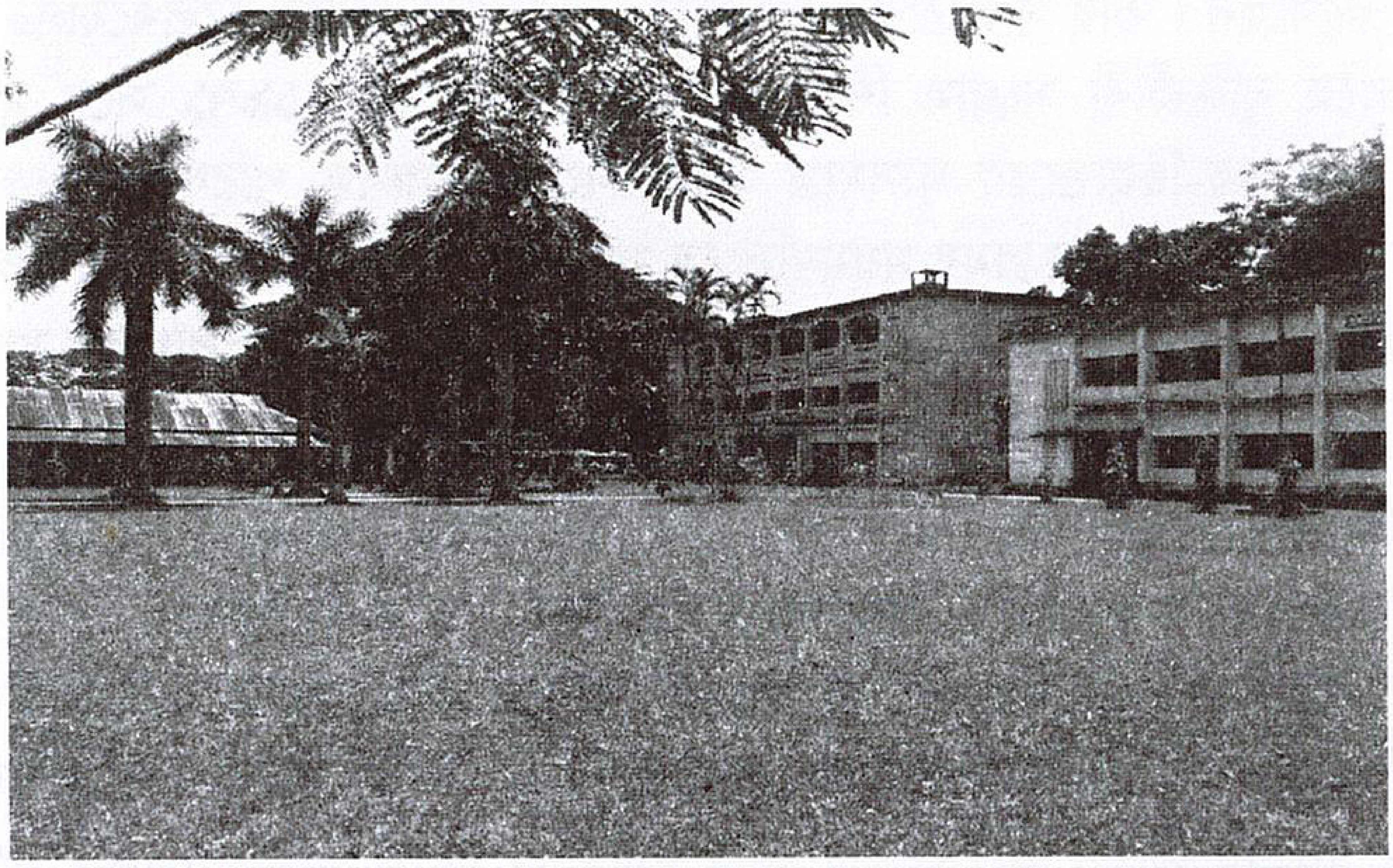

সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র
সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র সম্মাননাপত্র

বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা

বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ যতীন সরকার

সভ্যতার অগ্রগতি পিছিয়ে পড়ে, নতুন সভ্যতার জন্য অবশ্যম্ভাবী যে সংগ্রাম তাকে আহ্বান না করার মধ্য দিয়ে। এ যে বড় বিপর্যয় একটি অগ্রসরমান জাতির জন্য, অনেকে বিস্মৃতিতে তলিয়ে যান সমাজের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। আপনি আমাদের বুঝতে শিখিয়েছেন আমরা যেন ভুলে না যাই— শ্রম-ঘামে সভ্যতা গড়ে তোলা মানুষগুলোর কথা, যাঁদের কাছে ঋণী আমরা শক্তিমান, বুদ্ধিমান, কৃতিত্ব ও গৌরবের অধিকারী বলে। তাইতো, আপনার সাহিত্যসৃষ্টি আমাদের মুক্তি দিয়েছে কল্পলোক থেকে।

নবীনে নবীনে, প্রবীণে নবীনে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে পথ চলার মধ্য দিয়ে যে আনন্দ তার উৎস যে গণজীবনের সংস্কৃতি সে ধারায় আমাদের রেখেছেন জাগরুক।

মানবজীবনের প্রকৃত স্বরূপ যে মানুষের জীবন সংগ্রামের মধ্যে তৎপর্যবহ এবং তা থেকে খৈই না হারিয়ে স্বপ্নবান ও পূর্ণমানুষ হবার বাসনা আর শিক্ষা— তা আপনি দিয়েছেন। আপনি যে শিক্ষার মহানকারিগর।

গুণমুগ্ধ
নাসিরাবাদ কলেজের
শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও
গভর্নির বডির সদস্যবৃন্দ

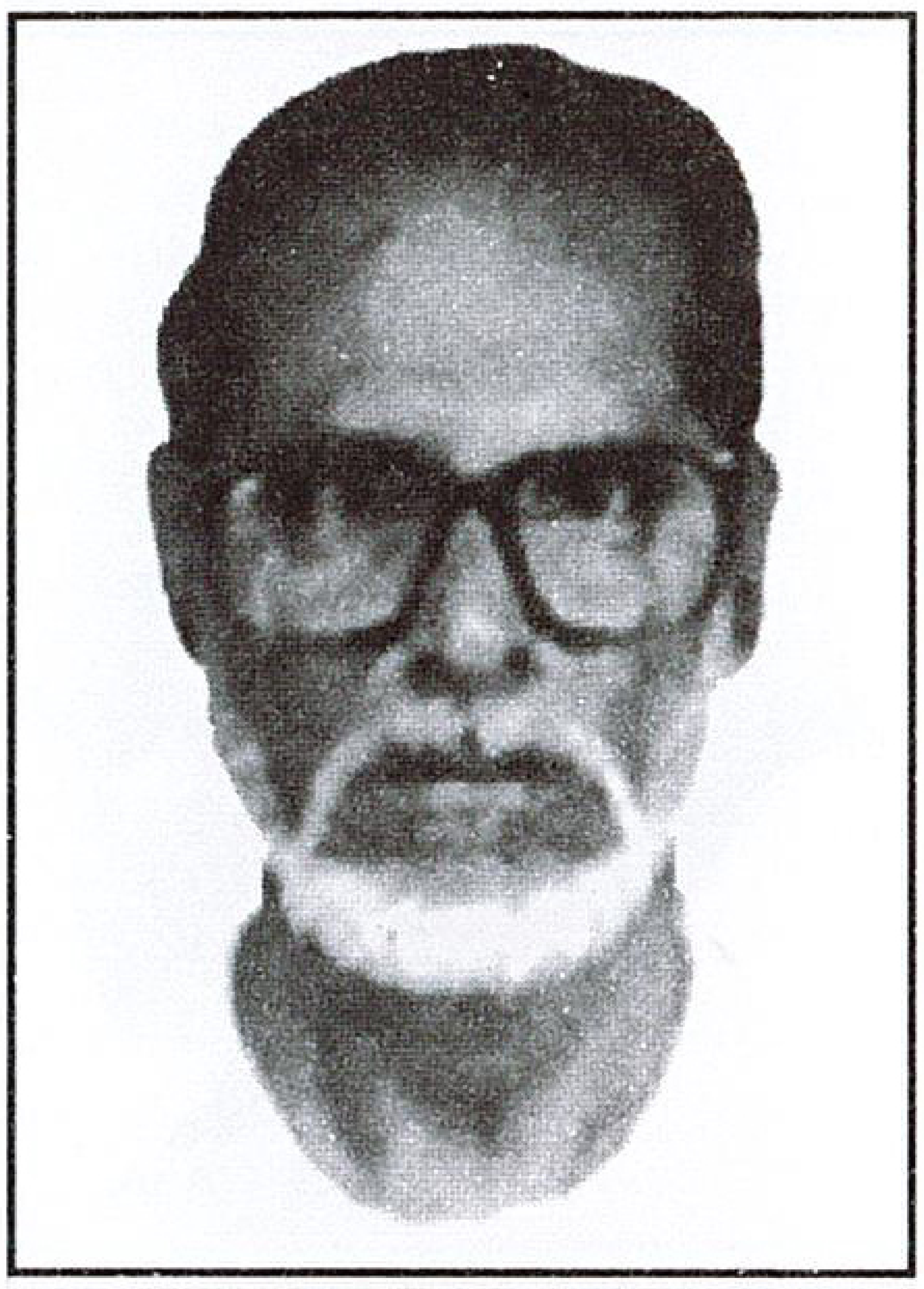

বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা

বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ মুহম্মদ রিয়াজুল ইসলাম

উন্নত সমৃদ্ধ জাতি ও দেশ গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিকল্প নেই। আর এ জন্যেই মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব বাংলাদেশে স্বৈরাচারের অশুভ শিক্ষানীতি এবং মুক্তিযুদ্ধ উত্তর পঁচাত্তরের পর আশির দশকে নয়া স্বৈরাচারের হাতে শিক্ষা ব্যবস্থা যখন ধ্বসের মুখোমুখি তখন শিক্ষা আন্দোলনে আপনার অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্বকে আমরা গর্বভরে স্মরণ করি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়ানোর ক্ষেত্রে আপনার যে অকৃত্রিম অনুরাগ তা থেকে পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষকগণ প্রেরণা খুঁজে পায়।

মানবজীবনের প্রকৃত স্বরূপ যে মানুষের জীবন সংগ্রামের মধ্যে তৎপর্যবহ এবং তা থেকে খৈই না হারিয়ে স্বপ্নবান ও পূর্ণমানুষ হবার বাসনা আর শিক্ষা— তা আপনি দিয়েছেন। আপনি যে শিক্ষার মহানকারিগর।

গুণমুগ্ধ
নাসিরাবাদ কলেজের
শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও
গভর্নির বডির সদস্যবৃন্দ

বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা

(মরণোত্তর)

বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ গোলাম সামদানী কোরায়শী

ব্যক্তির নয় শ্রেণিহীন সমাজ থেকেই সভ্যতার জয়গান করার মধ্য দিয়ে মুক্তির উপলব্ধি খুঁজেছেন আপনি আপনার সাহিত্যকর্মে। বহু ভাষাবিদ হিসেবে অনুবাদ সাহিত্যকে শুধু সমৃদ্ধ করেননি বিশ্বসাহিত্য ও সংস্কৃতিকে জানবার জন্য জানাবার জন্য সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

বহুমুখী প্রতিভা ধারণ করে কর্মোদ্যমী হয়ে আপনার পথ চলা আমাদের অণুপ্রাণিত করে।

আপনি ধারণ করেছেন-পুরাতনের নির্মূল, ধ্বংস ও নতুনের জন্ম ছাড়া মানবজীবনের সুষ্ঠুতরো বিকাশ সম্ভব নয়। আপনার বিশ্বাস আমাদের পাথেয়।

মানবজীবনের প্রকৃত স্বরূপ যে মানুষের জীবন সংগ্রামের মধ্যে তৎপর্যবহ এবং তা থেকে খৈই না হারিয়ে স্বপ্নবান ও পূর্ণমানুষ হবার বাসনা আর শিক্ষা— তা আপনি দিয়েছেন। আপনি যে শিক্ষার মহানকারিগর।

গুণমুগ্ধ
নাসিরাবাদ কলেজের
শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও
গভর্নির বডির সদস্যবৃন্দ

সম্পাদক
ড. আমিনুর রহমান সুলতান
আহ্বায়ক
বরেণ্য বুদ্ধিজীবী সম্মাননা কমিটি ও
সদস্য, গভর্নিং বডি
নাসিরাবাদ কলেজ, ময়মনসিংহ